Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২১ এপ্রিল, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২০ এপ্রিল, ২০১৫, সোমবার, ৬ বৈশাখ, ১৪২২

কলকাতার নির্বাচনে তৃণমূলি তাণ্ডবের প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ এপ্রিল : 'আহা কি আনন্দ, আকাশে বাতাসে।'

কার্জনগেটে সাতসকালেই ট্রাফিক পুলিশের গান বেজে চলেছে। এদিকে আকাশে বাতাসে বারুদের গন্ধ। কলকাতার রাজপথে তৃণমূলের সন্ত্রাসে তাজা রক্তের চাপ, চাপ ছাপ। পুলিশ হয়ে এতই নিষ্ঠুর। কলকাতায় ভোটে নিজেদের এক পুলিশ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। মিডিয়াও রেহাই পান নি তৃমমূল সন্ত্রাসের হাত থেকে। রেহাই পান নি সি পি আই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য এবং প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলিও। রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ গড়তে ভোটের আগের দিন কান্তি গাঙ্গুলির গায়ে হাত। বাদ যাননি তার ছেলে ও এজেন্ট সৌম্য গাঙ্গুলিও।

১৮ এপ্রিল এরই প্রতিবাদে গর্জে ওঠে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদী মানুষ। নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ এবং নপুংসক পুলিশি ভূমিকার প্রতিবাদে সামিল হয় মানুষ। টিভিতে সারাদিন চোখ রেখে কার্জনগেটে মানুষের ভিড় বাড়ে। প্রতিবাদে সামিল হওয়ার জন্য নাগরিক হিসাবে দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে পথ চলতি মানুষও সমর্থন জানায়। মিছিলটি কার্জনগেট হয়ে বি সি রোড ধরে পার্কাস রোড হয়ে আবার

কার্জনগেটে এসে পথসভায় মিলিত হয়।

পথসভা চলাকালীন এক মহিলা পুলিশ কর্মী হঠাৎ লাঠি চালায়। সমবেত মানুষ হকচকিয়ে যায়। উক্ত পুলিশ কর্মী নাকি মাঝেমধ্যেই খবরের শিরোনামে আসতে একাজ করেন। সাথে সাথে 'দিদির নজরে আসতে চান'। জনৈক পথচারী বলেই ফেললেন— তৃণমূলের গুলিতে কলকাতায় এক পুলিশকর্মী জীবন বেরিয়ে যাওয়ার মুখে। এদিকে ওনার চাটুকারিতা বড্ড গায়ে লাগছে।

এদিনের ধিক্কার মিছিলে সারা রাজ্যের সঙ্গে পা মেলালো আসানসোল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। গণতন্ত্রের দাবিতে সোচ্চার হন হাজার হাজার শ্রমিক। শিল্পাঞ্চলের সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন রানিগঞ্জ, ফরিদপুর, জামুরিয়া, চুরুলিয়া, খাসকেন্দা, দুর্গাপুর সর্বত্র মিছিল হয়। গুসকরার সংবাদদাতা, জানান এদিন শহরে ব্যাপক মানুষ মিছিলে অংশ নিয়ে পথ পরিক্রমা করেন। মিছিল লজপাড়া থেকে শুরু হয়ে হাটতলা ঘুরে স্টেশন চত্বরে এসে শেষ হয়। গলসি, বুদবুদ, কালনা, কাটোয়া, সর্বত্রই ধিক্কার মিছিল হয়েছে।

কৃষক সেতু সারাই : যানজটে অবরুদ্ধ দামোদরের দু-পার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ এপ্রিল : দক্ষিণ দামোদরের কৃষক সেতু সারাইকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার যাত্রী দৈনিক নাকালের মুখে। সকাল থেকে লম্বা জ্যামে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা চরম হয়রানির শিকার। আগামী ২১ এপ্রিল থেকে কোনো বাস, ট্রাক, পারাপার না করার আবেদন জানিয়েছে প্রশাসন। ফলে কার্যত দক্ষিণ দামোদরের মানুষ বর্ধমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কৃষক সেতুটি বর্ধমানের সঙ্গে দক্ষিণ দামোদরের একমাত্র যোগাযোগের সেতু। হুগলি, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলা এই সেতুর মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করে। সেতুটির ওপর দিয়ে দৈনিক চার হাজার যান চলাচল করে। কম করে দিনে চল্লিশ হাজার যাত্রী যাতায়াত করে কৃষক সেতু দিয়ে। ফলে হাজার হাজার মানুষ চরম বিপাকে পড়েছে।

আগামী ৬ মে পর্যন্ত কৃষক সেতু বন্ধ রাখার ঘোষণায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মধ্যে। এর আগে ১৫ এপ্রিল থেকে সারাই শুরু হওয়ার সময় থেকেই সমগ্র সেতু জুড়ে ওয়ান ওয়ে শুরু হয়। ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এক একটি যাত্রীবাহী বাসকে সেতু পেরিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে দেড় ঘন্টার বেশি সময় লেগেছে। দক্ষিণ দামোদরের সমস্ত গ্রাম থেকে রোগী নিয়ে হাসপাতাল যেতে জরুরি রোগীর দফারফা। বিকল্প ব্যবস্থা না করে সেতুটির সরাইয়ের কাজ শুরু করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন বাস ইউনিয়ন। এভাবে একতরফা প্রশাসনের সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছে নিত্যযাত্রীরা।

তিনটি জেলাকে বর্ধমানের সঙ্গে সংযুক্ত করার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি এভাবে বন্ধ হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে সব মহলে। বিকল্প কাঠের সেতু না করে এভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেতুকে বন্ধ করে কাজ করায় কৃষি, খাদ্য, অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

বোরো পাকছে, চিন্তা বাড়ছে কৃষকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেতুগ্রাম : মাঠে মাঠে বোরা ধান পেকে উঠছে। আর চিন্তায় কপালে ভাঁজ বাড়ছে কৃষকের। আগে ধান পাকলে ফসল তোলার আনন্দে আহ্লাদে আটখানা হতো কৃষক। এখন সরকারি নীতি তার সে আনন্দ হরে নিয়েছে। এখন ধান পাকলে কৃষকের বেদনা আরও গাঢ় হয় কেন? গত মরশুমের দামের অভাবে ধান বিক্রি করতে পারেন নি। গোলা ভর্তি রয়ে গেছে। কারো বা তার আগের মরশুমেরও আছ। দাম আজ বাড়বে কাল দাম বাড়বে বলে আশায় আশায় রেখে দিয়েছেন। এবার? হয় জলের দামে বেচতে হবে, নতুবা নতুন ধান রাখার জায়গা নেই। জলের দরে খামার থেকেই বেচে দিতে হবে।

মুনিশ-মান্দার মহাজনের পাওনা মেটাতে হবে। তাই ওই মন্দা দামেই কষ্টের ধান বিক্রি করে দিতে হবে। এ তো গেল মনুষ্য সৃষ্টি সমস্যা। এর বাইরে আছে প্রকৃতির ক্রুর দৃষ্টি। এ বছর ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি-শীলা হামেশা হচ্ছে। এখনো আকাশে আশঙ্কার কালো মেঘ যে কোন সময় বৃষ্টি নামার মতো আবহাওয়া।

আর কে না জানে এক ছাট বৃষ্টি হলে বোরোর দাফারফা। কাদা মাঠে ধান নিয়ে নাজেহাল হবেন কৃষক। না নামবে গাড়ি, ট্রাক্টর, না পাওয়া যাবে মজুর। সেজন্যেই তো বোরো পাকলে কৃষকের আশঙ্কা অনেকটা।

আদিবাসী অধিকার মঞ্চের ডেপুটেশন ও সমাবেশ বর্ধমানে

আদিবাসী অধিকার মঞ্চ বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে শহিদ মঙ্গল হেমব্রম-এর হত্যাকারীদের শাস্তি সহ ১৮ দফা দাবির ভিত্তিতে নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র সহ মিছিল সহযোগে বর্ধমানের জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হল আজ। ডেপুটেশন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুরেন হেমব্রম, বিনয় হাঁসদা, বায়সী মার্ডি, রবীন টুডু, সনাতন টুডু প্রমুখ। প্রায় ১০ সহস্রাধিক আদিবাসী মানুষ অংশ নেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই আদিবাসী অংশের মানুষ তাদের পারম্পরিক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। মিছিলটি ছিল দৃষ্টিনন্দন।

চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা বাঁচাতে 'সেভ সি এল ডব্লু কমিটি'র আন্দোলন

প্রসূন রায়

চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানার গুরুত্বকে খাটো করে বেসরকারি ক্ষেত্রে উৎপাদন পাচারের প্রক্রিয়া অব্যহত রাখল মোদি সরকার। শুধু তাই নয়, রেলে প্রত্যক্ষ বেসরকারি বিদেশি বিনিয়োগের ঘোষণায় এখানকার রেলকর্মীদের মনে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি রেল বাজেটে চিত্তরঞ্জনের বিকাশের জন্য কোনো বরাদ্দ না রেখে বিহারের দুটি পি পি পি মডেলে কারখানা তৈরির বরাদ্দের খবরে উদ্বেগ আরো বেড়েছে। এর আগে মমতা ব্যানার্জি ডানকুনিতে পি পি পি মডেলে রেলইঞ্জিন কারখানা তৈরির উদ্যোগ নেন। বর্তমান সরকারের সময়ে সেখানে জাপান থেকে ২০০ ইঞ্জিন কেনার প্রক্রিয়া চলছে প্রযুক্তি হস্তান্তরের নামে। এই ইঞ্জিন সরবরাহের ক্ষেত্রে জাপানের তিনটি বহুজাতিক সংস্থা যৌথভাবে টেন্ডারে অংশ নিয়েছে। পি পি পি তথা প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ-এর অর্থ রেলের উৎপাদনকে বেসরকারি উদ্যোগের হাতে তুলে দেওয়া। এদিকে, চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের বর্তমান উৎপাদন বর্ষের অক্টোবরেই তাদের কনভেনশনাল প্রযুক্তির ইঞ্জিন উৎপাদন চিরতরে বন্ধ করে দেবার কথা ঘোষণা করেছে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানায় বিকশিত কনভেনশনাল এবং থ্রি ফেজ বিদ্যুৎ ইঞ্জিন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা থেকে দাউদ ও ভুসোওয়ালের দুটি লোকো মেরামতি শেডকে বেশ অনেকগুলি ইঞ্জিন উৎপাদনের কাজ দেওয়া হয়েছে। আগামী উৎপাদন বর্ষে কেবল থ্রিফেজ প্রযুক্তির ইঞ্জিনই উৎপাদন করা হবে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানায়। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ ইঞ্জিনের প্রায় সবকটি যন্ত্রাংশই ১০০ শতাংশ অফলোডিং করে বেসরকারি সংস্থা থেকে কিনে আনা হচ্ছে। এই কারখানায় কেবল যন্ত্রাংশ জোড়া দেওয়ার কাজই চলছে। ফলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা তুলনামূলকভাবে বাড়লেও কর্মী সংখ্যা ১৭ হাজার থেকে কমে ১২ হাজারে নেমে এসেছে। এই অবস্থায় শ্রমিকরা হিন্দুস্তান কেবলস কারখানার মতো আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার সবকটি ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ আন্দোলনের লক্ষ্যে 'সেভ সি এল ডব্লু কমিটি' গঠিত হয়েছে। এই কমিটির কনভেনার সি এল ডব্লু লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অলোক ঘোষ জানান, ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের উদ্বেগের কথা জানিয়ে রেল বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করে রেলমন্ত্রী এবং রেলবোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে শ্রমিকদের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দিয়েছি। ইতিমধ্যে কনভেনশন, গেট মিটিং, ডিপার্টমেন্টসভা, প্রচারপত্রের মধ্যে দিয়ে রেল কারখানার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। অতীতে রেলের উৎপাদনকেন্দ্রগুলিকে কর্পোরেট করার অপচেষ্টা রোখা হয়েছে। যৌথ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এবারও আমরা চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানাকে বাঁচাতে সমর্থ হব সমস্ত অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে।

নতুন চিঠি

২০ এপ্রিল, ২০১৫

আগামী পুরভোটের স্টেজ রিহার্সাল?

কলকাতা পুরসভার নির্বাচন গত ১৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল। সারা দিন ধরে চলল 'গণতন্ত্রের' মহড়া। শুধু সারাদিন কেন? আগেরদিনই তো প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সম্পাদক কান্তি গাঙ্গুলীকে চড়চাপটা ইত্যাদি প্রকরণে নন্দিত করা হল। বৃদ্ধ সি পি আই(এম) নেতা বুঝলেন কাহাকে গণতন্ত্র বলে, কাহাকে অবাধ নির্বাচন বলে। নির্বাচনের দিন সমস্ত মিডিয়াই তুলে ধরলো বাস্তব চিত্র গণতান্ত্রিক(?) প্রক্রিয়ায়। জালভোট, ছাপ্পাভোট (এক্ষেত্রে বোতাম টেপা) বুথ দখল করে দরজা বন্ধ করে পুলিশ পাহাড়ায় বোতাম টেপা—এ সবই ইতিমধ্যে জেনে গেছেন তামাম পাঠককুল দর্শককুল। কেমন ভোট? স্বয়ং নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করলেন ভোট শেষের সাংবাদিক সম্মেলনে সঠিক ভোট হয়নি, সারাদিন প্রচুর অভিযোগ এসেছে, প্রয়োজনে বেশ কিছু বুথে ফের নির্বাচনের প্রয়োজন হতে পারে। অবশ্য সন্ধ্যাবেলায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন 'এত ভাল সুশৃঙ্খল ভোট অতীতে কখনো আর হয়নি।' এর সঙ্গে পো ধরলেন পুলিশ কমিশনার স্বয়ং—আমার পুলিশ তো চ্যাম্পিয়ান।

সারা দেশ প্রত্যক্ষ করলো শাসকদলের তাণ্ডব। বুথে বুথে জাল জুয়াচুরির পসরা। পুলিশ অসহায় দর্শক—চাকুরি বাঁচানো বা প্রমোশন এসব বাধ্যবাধকতা তাকে ধ্যানী বুদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে। তাতেও রেহাই নেই। কলকাতার সিংঘী বাগানে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার শাসকদলের দাপুটে ক্যাডারের গুলিতে আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। তবুও সব শান্তিপূর্ণ। পরদিন অবশ্য নির্বাচন কমিশনার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন। ওহো কী আদর্শ নির্বাচন হয়েছে। (পেনশন প্রমোশন উত্তর-চাকুরি জীবনের আরো কিছু) ভবিষ্যৎ বলে কথা! স্বয়ং পুরমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। বিশেষজ্ঞগণ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন আগামী পুরভোটের স্টেজ রিহার্সাল কি এটি?

সি পি আই(এম)-এর ২১তম কংগ্রেস : পতাকা উত্তোলন জেলা জুড়ে

অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে শুরু হল সি পি আই(এম)-এর এক বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেস। কংগ্রেসের সূচনা মুহূর্তে দেশব্যাপী পতকা উত্তোলনের কর্মসূচি ছিল সি পি আই(এম)-এর। এদিন বর্ধমান জেলা দপ্তরে পতকা উত্তোলন করেন দলের প্রবীণ নেতা অরিন্দম কোঙার। এদিন গোটা দেশের সঙ্গে বর্ধমান জেলার সর্বত্রই পতকা উত্তোলন হয়েছে মহা সম্মেলনের সূচনা লগ্নে।

পূর্বস্থলীতে স্মারকলিপি বিডিও-কে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৬ এপ্রিল : পঞ্চায়েতের আর্থিক দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ দলবাজির প্রতিবাদে বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হল। মুকশিমপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি আই(এম)-এর নির্বাচিত সদস্য, সমিতির সদস্য, বিরোধী দল নেতার নেতৃত্বে ছ-দফা দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয় পূর্বস্থলীর ২ বিডিওর হাতে। বিডিও আলোচনায় জানান কাজকর্মের অভিযোগ নিয়ে তিনি তদন্ত করবেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন কবে নিহত হন? তাঁর জন্ম কবে হয়েছিল?
২. ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ কবে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে? কোথায় কত এলাকা তারা দখল নেয়?
৩. সিপাহি বিদ্রোহের নেতা তাঁতিয়া তোপিকে কবে ফাঁসি দেওয়া হয়?
৪. বর্ধমান পুরসভা কবে সরকারি নির্দেশে কার্যকর হয়েছিল?
৫. প্রখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কবে কোথায় জন্ম হয়? তাঁর বিখ্যাত ছবি মনোলিসা-র ঠোঁট আঁকতে তিনি কত সময় নেন?
৬. ডেনমার্ক দেশটি কোথায়? রাজধানী কোথায় অবস্থিত? কবে দেশটি স্বাধীন হয়েছিল? দেশের জাতীয় প্রতীক কী?
৭. কতগুলি দ্বীপ নিয়ে ডেনমার্ক গঠিত?
৮. প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন-এর আসল নাম কী? তাঁর কবে কোথায় জন্ম হয়? মৃত্যু কবে?
৯. ভারতে লোকসভা প্রথম কবে গঠিত হয়?
১০. ঈগল পৃথিবীর কতগুলি দেশের জাতীয় প্রতীক?
১১. প্রখ্যাত আইনজীবী ভবদীশ রায় কবে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন?
১২. বিশ্বত্রাস হিটলার কোথায় কবে জন্মান? কবে কীভাবে মৃত্যু হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

লেনিন আজও সমাজ পরিবর্তনের পথ নির্দেশক

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

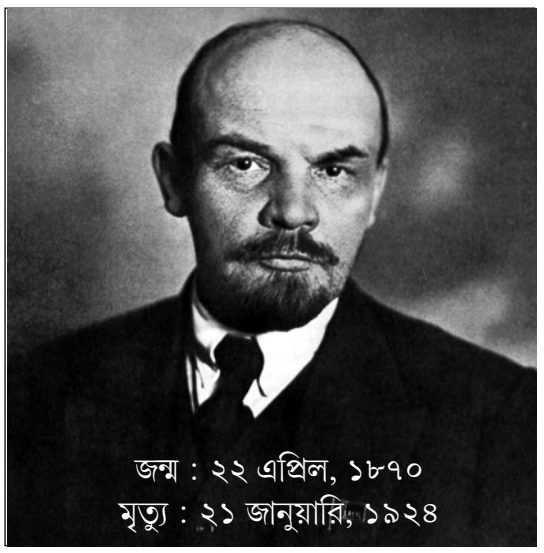

জন্ম : ২২ এপ্রিল, ১৮৭০
মৃত্যু : ২১ জানুয়ারি, ১৯২৪

মার্কসবাদ শুধুমাত্র একটি দার্শনিক তত্ত্ব নয়, তা হল প্রয়োগের দর্শন—শুধু পরিবর্তমান সমাজের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দান নয়, তার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দর্শন। সমাজ বিকাশের ধারায় শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও শ্রেণিহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণ তার লক্ষ্য। কমিউনিস্ট পার্টি হল শ্রমজীবী মানুষের সেই সংগঠিত অগ্রবাহিনী, যা প্রয়োগের মাধ্যমে এই দর্শনকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় ভুমিকা পালন করে। রাশিয়ার সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে ইতিহাসের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের রূপকার ছিলেন লেনিন। তাই মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ শব্দবন্ধটি তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের এই সম্মিলনকেই চিহ্নিত করে।

সমাজ পরিবর্তনের পর্যায়গুলিকে সাধারণ ভাবে আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাসব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ ও শ্রেণিহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু প্রত্যেক দেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপরই নির্ভর করে তার পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট পর্যায়। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণিই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু রাশিয়ার পরিস্থিতি ছিল ভিন্নতর। ইতিমধ্যে বিশ্ব পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ পরিণত হওয়ায় সেখানে বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নীত করার বাস্তব পরিস্থিতি ছিল না। এই বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই লেনিন শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উন্নীত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁরই নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও নভেম্বরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে।

মার্কস মনে করতেন প্রত্যেকটি পরিবর্তনের রূপকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা এবং একের সঙ্গে অপরের তুলনার মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত সূত্রে পৌঁছানো সম্ভব। একটি ঐতিহাসিক-দার্শনিক তত্ত্বকেই সকল দরজা খোলার মহাচাবি (Master-key) হিসাবে ব্যবহার করতে গেলে তা একটি অতি-ঐতিহাসিক(Supra-historical) প্রয়াসে পরিণত হতে বাধ্য বলে তিনি মনে করতেন। (১৮৭৭ সালের নভেম্বরে রাশিয়ার Otechestvenniye Zapisski পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর চিঠি।) লেনিন এই সত্যকেই প্রমাণ করলেন সোভিয়েত বিপ্লবের মাধ্যমে। ১৮৮১ সালে, মৃত্যুর মাত্র ২ বছর আগে, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর দ্বিতীয় রাশিয়ান সংস্করণের ভূমিকায় রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতির বিচারে এঙ্গেলস-এর সঙ্গে যুগ্ম স্বাক্ষরে মার্কস লিখেছিলেন, রাশিয়ার জমির যৌথ মালিকানাও কমিউনিস্ট বিকাশের প্রস্থান বিন্দু হিসাবে কাজ করতে পারে।

ছকে বাঁধা কোনো পদ্ধতি যে সব সমাজের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য নয় এবং প্রতিটি সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এবং তদুপযোগী কর্মসূচির ভিত্তিতেই যে কেবল তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব, এই মৌলিক সত্যটির প্রতি মার্কস যেমন বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তেমনি লেনিন বা মাও-জে-দঙ্-এর মতো মার্কসবাদের সার্থক উত্তরসূরিরা প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। মানুষই সমাজ গড়ে এবং সমাজ পাল্টায়। কিন্তু সমাজেরও নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুগত একটি দিক আছে বলে যেমন-তেমনভাবে মানুষ তা পারে না। রাশিয়া ও চিন তার অন্যতম প্রমাণ। ভারতের ক্ষেত্রেও তার বিশেষ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে মার্কস 'এশীয় ব্যবস্থা' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তার বর্ণ ও জাতব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ইত্যাদিকে সার্থক ভাবে শ্রেণিবিভাজনের উত্তীর্ণ করা এবং সমষ্টিগত চেতনা, সংগঠন ও সংগ্রামের সার্থক রূপায়ণের উপরই নির্ভর করছে ভারতীয় বিপ্লবের সম্ভাব্যতা। ভারতের ক্ষেত্রে তাই লেনিনবাদের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা এইখানে যে একদা ঔপনিবেশিক শাসনাধীন এই দেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা ও তার দ্বারা লালিত সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলার ফলে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি তার গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তাই লেনিন-প্রদর্শিত পথে শ্রমিক শ্রেণি ও তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আশু লক্ষ্য সমাধা করে তবেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে হবে।

একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মধারা ও নেতৃত্বের মৌল নীতি হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। মার্কস ও এঙ্গেলসই প্রথম এই সাংগঠনিক নীতি সম্পর্কে ধারণার সূত্রপাত করেন এবং সেই অনুসারে ১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগ-এর সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। লেনিন এই সাংগঠনিক ধারণাটির ক্রমবিকাশ ঘটান এবং ১৯১৭ সালে RSDLP (Bolshevik)-এর ষষ্ঠ কংগ্রেসের এই নীতিকে সংজ্ঞাবদ্ধ করে বলা হয় : (১) সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্ব নিম্ন স্তর পর্যন্ত দলের সমস্ত নির্দেশদাতা সংস্থাগুলিই হবে নির্বাচিত, (২) সমস্ত দলীয় সংস্থাকেই নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সংশ্লিষ্ট দলীয় সংগঠনের কাছে তার কাজকর্মের জবাবদেহি করতে হবে, (৩) দলীয় শৃঙ্খলা কঠোরভাবে বলবৎ করতে হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ বাধ্য থাকবে, (৪) উচ্চতর সংস্থার সমস্ত সিদ্ধান্ত নিম্নতর সংস্থা এবং সমস্ত দলীয় সদস্যের পক্ষে মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এককথায়, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ 'আলোচনায় স্বাধীনতা, কর্মে ঐক্য'। এই দুয়ের মধ্যে যথার্থ ভারসাম্য রক্ষার উপর একটি কমিউনিস্ট পার্টির সার্থক পরিচালনা নির্ভর করে। গণতন্ত্রের নামে যে-কোনো মতের যথেচ্ছ প্রকাশ যেমন দলকে একটি বিতর্ক সভায় পরিণত করবে, তেমনি কেন্দ্রিকতা যদি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে পরিণত হয় তাহলে নতুন নতুন চিন্তা উঠে আসার প্রক্রিয়াকে তা প্রতিহত করবে। 'কেন্দ্রিকতা' যেহেতু বিশেষ্যপদ, সেহেতু তার 'গণতান্ত্রিক' বিশেষণটির সীমা অনেকক্ষেত্রেই গৌণ হয়ে যায় এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 'দান'-এর ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে। নেতৃত্ব যদি সমালোচনা সম্পর্কে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, তাহলে সঠিক বক্তব্য তুলে ধরার বদলে নেতৃত্বকে খুশি রাখা এবং তাঁরা যা শুনতে চান তেমন কথা শোনাবার প্রবণতা গড়ে উঠতে পারে। নেতৃত্ব যদি এই প্রবণতাকে রোধ করার পরিবর্তে তার শিকার হয়ে পড়েন, তাহলে ক্ষমতাসন্ধানী কৌশলী চাটুকারদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সত্য পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী।

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তার গণসংগঠনগুলির 'আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য' ও ভারসাম্যের উপর লেনিন গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দলের সিদ্ধান্তকে গণ-সংগঠনের সিদ্ধান্তে পরিণত করার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে যদি দলের সিদ্ধান্তকে সরাসরি গণ-সংগঠনের উপর চাপিয়ে দেওয়ার যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিণত করা হয়, তাহলে উভয়ের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং গণ-সংগঠনের প্রসার ও তার মাধ্যমে দলের বৃত্ত সম্প্রসারণের প্রক্রিয়াটিও ব্যাহত হয়। বিশেষত ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উভয়ের সম্পর্কের ভারসাম্যের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

লেনিনের জন্মদিন এইসব বিপ্লবী দায়িত্ব ও কর্তব্যের বার্তা নিয়েই প্রতিবছর আমাদের সামনে উপস্থিত হয়।

একটি ছোট্ট ঘটনা (কাল্পনিক)

শ্রী চারশো বিশ

সেদিন রাজপ্রাসাদে হৈ-হৈ কাণ্ড, রৈ-রৈ ব্যাপার। রাজবাটীর বীক্ষণাগারের উপরে যে জলের ট্যাঙ্ক রহিয়াছে তাহার উপর গোরাচাঁদ নামক এক যুবক চড়িয়া বসিয়াছে। পাত্র-মিত্র-অমাত্য-রাজসৈন্য-দমকল সকলেই একে একে হাজির হইল। গুরুজি তাহাকে নাকি তার 'প্রাপ্য' শ্রেণিতে ঠাঁই দেননি। এদিকে উপর হইতে গোরাচাঁদ মুহুর্মুহু হুমকি দিতেছে "হোয়েন আই কল। পোলিস কামিং। গুরুজি অন জেল। গুরুজি চাক্কি পিসিং এন্ড পিসিং এন্ড পিসিং।" আর মাঝে মাঝে ট্যাঁক ঘড়িতে সময় দেখিতেছে।

এতদ্দৃশ্য অবলোকন করিয়া গোরাচাঁদের বন্ধুবর্গের অশ্রু বাঁধ মানিল না। তাহারা নিচ হইতে পোঁ ধরিল "গোরা রে তুই নেমে আয় / নেমে আয় / নেমে আয়।"

গোরাচাঁদ নট নড়ন, নট চড়ন। বার বার হুমকি দিতেছে। আর সময় গুনিতেছে।

শেষাবধি গোরাচাঁদের কতিপয় অনুরাগী পাইপ-বাহিয়া রোমহর্ষক কায়দায় উপরে উঠিয়া গোঁরাচাঁদকে কোলপাঁজা করিয়া নামাইয়া আনিল।

রাজসৈন্য পাত্র মিত্র অমাত্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরদিন রাজসভা বসিল। পাত্র-মিত্র-আমাত্য গুপ্তচর-বিদূষক সকলেই হাজির।

রাজা কহিলেন, ভাগিনা এ কী কথা শুনি!

ভাগিনা কহিল, মামা গুপ্তচর সংবাদ আনিয়াছে।

গুপ্তচর কহিল, মহারাজ। অভয় দিলে নিবেদন করি। এই গোরাচাঁদ নামক যুবকটি একদা চরম রাজভক্ত ছিল। রাজকার্যে কোনোরূপ খুঁত দেখিলেই যে সকল নিন্দুকরা খুঁতখুঁত করিয়া থাকে তাহাদের লাঠ্যৌষধি প্রয়োগে উহার জুড়ি মেলা ভার ছিল। সম্প্রতি সে কিঞ্চিৎ বিগড়াইয়া গিয়াছে।

রাজা কহিলেন—এ তো ভালো কথা নয়। রাজবৈদ্য তোমার কাছে কোনো বিধান আছে?

রাজবৈদ্য প্রস্তুতই ছিলেন। নিদান দিলেন। বলিলেন—রাজন্, উহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। মস্তকে ব্রাহ্মীশাকের রস মালিশ করতে হবে।

—এরপর চারের পাতায়

নানা প্রকল্পে খামতি আর প্রতিশ্রুতিভঙ্গে কাঠগড়ায় পুরবোর্ড

আলেক শেখ, কালনা, ১৮ এপ্রিল : ২৬টি গভীর নলকূপ বসিয়েও কালনা শহরের ৫৫ হাজার নাগরিকের পানীয় জলের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। ফলে বিগত বামবোর্ড চিন্তা-ভাবনা শুরু করে নদীর জল ব্যবহার করার। ২০০৭ সালে সিদ্ধান্ত হয় শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভাগীরথী নদীর জলকে ব্যবহার করে কালনা জল-প্রকল্প তৈরি করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রায় ৪২ কোটি টাকার জল প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। অনুমোদন আসার পরেই এসে যায় ২০১০-এর পৌর-নির্বাচন। এই নির্বাচনে জয়ী হয় তৃণমূল। জয়ী হয়েই কালনা পুরবোর্ড তড়িঘড়ি কয়েকজন মন্ত্রী এলে জলপ্রকল্পটি উদ্বোধন করে দেয়। উদ্বোধনই শেষ, তারপর আজও পর্যন্ত জল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি। অথচ নতুন করে পুরভোট এসে গেছে। কবে জল প্রকল্পের কাজ শুরু হবে কেউ না বলতে পারলেও তৃণমূলিরা নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে দিনে ৭ ঘন্টার জায়গায় ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহ করা হবে। ২০১৪-এর নির্বাচনের প্রাক্ কালে তৃণমূলিদের প্রতিশ্রুতি ছিলো দিনে ১২ ঘন্টা জল এবং কোন জলকর নেওয়া হবে না। নতুন প্রকল্প চালু হলেই কালনার নাগরিকরা জল কর দিতে বাধ্য। কারণ, কালনা পুরসভার বর্তমান পুরপতি তথা কালনার তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গোপনে জলকর নেওয়ার লিখিত মোছলেকা দেওয়ার কথা এই প্রতিবেদনের নিকট স্বীকারও করেছেন। কিন্তু যে ভাগীরথী নদীর জল-প্রকল্প নিয়ে একটার পর একটা প্রতিশ্রুতি, সেই ভাগীরথী নদীতেই শহরের হাইড্রেনের নোংরা জলে গিয়ে মিশছে। এ ব্যাপারে কালনা পুরসভা যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার কোনো উদ্যোগ তো নেয়নি, বরং কালনা পুরবোর্ড ক্ষমতায় আসার গোড়াতেই পুরসভার নিজস্ব জঞ্জাল ফেলার ৮ বিঘা জায়গা জলের দরে বিক্রি করে দেয়। তারপর শহরের সমস্ত জঞ্জাল ভাগীরথী নদীবক্ষেই ফেলা শুরু হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কালনার নাগরিকরা। প্রবল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পুরসভার জঞ্জাল ফেলার কর্মসূচি বন্ধ হয়। সেই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন কালনা পুরসভার ২, ৩ এবং ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ফলে তৃণমূল প্রার্থীরা এই ওয়ার্ডগুলোয় গিয়ে কোন পাত্তা-ই পাচ্ছেন।

শুধু কি ভাগীরথী দূষণ? তৃণমূল পুরবোর্ডের জামানাতেই বিক্রি হয়ে গেছে কালনা সমাজবাড়ি যে সমাজ বাড়ি যে সমাজবাড়িতে রয়েছে বর্ধমান রাজ-পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের সুন্দর-সুন্দর স্মৃতি মন্দির। সেই মন্দিরগুলি থেকে রাতের অন্ধকারে বিগ্রহ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বাড়ি ঘর ভাঙার আগে ফাঁকা জায়গাগুলো বিক্রি করা হয়েছে। অথচ রাজ্য সরকারের প্রথম পর্যটন মন্ত্রী রাজপাল সিং কালনার সমাজবাড়ি দেখে অবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন সরকারের পক্ষ থেকে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সমাজবাড়ি বিক্রিতে যাদের হাত ছিলো তাদের মধ্যে এবার কয়েকজন তৃণমূলের প্রার্থী।

২০০৬ সালে কালনায় গড়ে ওঠে শিশু পার্ক। যার নাম পুরবিতান। সেই পার্ক এখন জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় অসামাজিক কাজের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রাক্তনমন্ত্রী বিলাসীবালাসহিস-এর উদ্বোধন করা পার্কে একসময় বিভিন্ন ফুলের প্রদর্শনী হতো। আজ তা ইতিহাস। পশ্চিমবাংলার যতগুলি প্রাচীন পুরসভা আছে কালনা পুরসভা তার অন্যতম। এই পুরসভা তৈরি হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল। চৈতন্য মহাপ্রভু, শক্তি সাধক ভবা পাগলা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মনিষীদের পদধূলী ধন্য এই কালনা শহর। এখানে ছিলো সহস্রাধিক রিক্সা শ্রমিক। টোটোর দাপটে রিক্সা শ্রমিকদের জীবিকা শেষ হয়ে গেছে। তারা এখন পরিযায়ী শ্রমিক। ২০১০-র পুর-নির্বাচনে তৃণমূলিদের জয়ী করতে রিক্সা শ্রমিকরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলো। কিন্তু জীবিকা হারা হওয়ার পর তারা এবার জ্বলছে। সেই জ্বলুনির প্রভাব পড়বে সামনের পুরভোটে। ঢাক-চাক, গুড়গুড় না করে প্রকাশ্যেই বলছেন রিক্সা শ্রমিকরা। তাই চেতনায় ঘা-পাড়া এই পুর নির্বাচনে তৃণমূলিরা জয়ের তেকে অনেক দূরে তা তৃণমূলিরাও উপলব্ধি করছেন। তাই জয় ছিনিয়ে নিতে হুমকি ধমকি চমকানি সস্ত্রাসই একমাত্র তৃণমূলিদের হাতিয়ার। সেই হাতিয়ারকে সম্বল করেই পুরভোটের সামনা-সামনি হচ্ছেন তৃণমূলিরা।

বয়স ছাড়া কিছুই বাড়েনি দাঁইহাঁটে

পার্থ চৌধুরী ও সন্দীপ ঘোষচৌধুরী

বর্গী হামলার সময়কার ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্গামন্দির আর বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচাঁদের সমাধি মন্দির সমাজবাড়ির নিদর্শন বুকে নিয়ে ভাগীরথীর তীরে ‘দুয়োরানি’ দাঁইহাঁট। ‘বারোঘাট / তেরোহাট’ প্রবাদের এই ছোট্ট জনপদ একসময় কাঁসা-পিতলের ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। এখন তা সরে গেছে নদীয়ায়।

রাজ্যে আগামী ২৫ মে ভোট হচ্ছে যেসব পুরসভার বয়সের বিচারে তাদের মধ্যে অন্যতম এই দাঁইহাট। ১৮৬৯ সালে এই পুরসভার জন্ম। কিন্তু এতগুলো বছর পেরিয়েও রাজ্যেরই অনেক ‘গঞ্জের’ চেয়ে পিছিয়ে ছোট্ট শহরটি। অনুন্নয়ন এতটাই প্রকট যে নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ বলতে ছাড়লেন না—‘এর চেয়ে পঞ্চায়েত করে দিলেই ভালো হত’।

যেমন ছাত্রী ঝুমকি ঘোষ। তার দাবি, শহরে অবিলম্বে কলেজ তৈরি হোক। এ দাবিটা এবারে শহরের মানুষের মুখে মুখে।

একসময়কার বানিজ্যকেন্দ্র দাঁইহাটে আজ উন্নয়ন থমকে। ব্যবসায়ী গৌতম মণ্ডল বললেন, রাস্তাঘাট অপরিষ্কার। অপরিকল্পনার ছাপ সর্বত্র। যোগাযোগ অনুন্নত। শহরকে সাজাতে উদ্যোগী নয় কেউ-ই।

শহরে নেই কোনো হাসপাতাল। ন-পাড়ার স্বাস্থ্য কেন্দ্র বেহাল। শিক্ষিকা কল্যাণী দে জানালেন, গুরুতর অসুস্থ মানুষ বা আসন্নপ্রসবা কাউকে কাটোয়ায় নিয়ে যেতে ভীষণ ভয় করে। পাছে কিছু বিপদ হয়ে যায়।

উন্নয়ন-অনুন্নয়ন এই তরজায় সুস্পষ্ট নীতিগত অবস্থান বামফ্রন্টের। তাদের বক্তব্য ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ চরম উদাসীন ছিলো সরকার। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭ দাঁইহাটে কোনো পুরভোটই করেনি কংগ্রেস। ৭৭-এ বামেরা এসে বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়নের ধারণাকে স্থানীয়স্তরে পৌঁছে দেয়। তাদের আরও দাবি ২০০৫ থেকে ২০১০ বামবোর্ড উন্নয়নে এনেছিল বিকল্প পরিকল্পনার ছাপ। কংক্রিটের ঝকঝকে রাস্তা, পোস্টে আলোর ব্যবস্থা, সর্বত্র ড্রেন তৈরি হয়েছিল।

গরিব মানুষের জন্য ৩৯০ টি পাকা বাড়ি, ৫৮০টি শৌচাগার তৈরি হয়। তৈরি হয় যৌথ-উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র। বর্তমান বোর্ডের আমলে কেবল স্বার্থ, ক্ষমতা আর বখড়ার লড়াই দেখেছে মানুষ।

এমনিতে শান্ত ছোট শহর দাঁইহাট। শহরের বাসিন্দা প্রশান্ত ব্যানার্জী বললেন, এমনিতে খুব একটা গোলমাল নেই। তবে উত্তেজনা বাড়ছে এবারের ভোটে। শান্তিতে ভোট চান তিনি।

এলাকার প্রবীণ মানুষ অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী বিশ্বনাথ মুখার্জী। তাঁর কথায়, স্থায়ী বাসস্ট্যাণ্ড চাই। রাস্তাঘাটে নজর বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে নদীয়ার সাথে যোগাযোগ। জড়াজীর্ণ নদীঘাটের সংস্কার চাই। সভায় পুরভোটে যুগ্মভাবে বোর্ড গড়েছিল কংগ্রেস আর তৃণমূল। কংগ্রেস -৬, টি এম সি-২। পরে ১ নির্দল, ১ কংগ্রেস কাউন্সিলার টি এম সি-তে যোগ দেন। বাড়তে থাকে দ্বন্দ্ব। দেড় বছর আগে সমর্থন প্রত্যাহার করে তৃণমূল কংগ্রেস। এবারে সম্মুখসমরে মুখোমুখি দুই প্রাক্তন শরিক। প্রাক্তন কংগ্রেসি সুদীপ্ত রায় এবার টি এম সি-র প্রচারের অন্যতম মুখ। তাঁর দাবি, এ বোর্ড তৃণমূলকে পাত্তা দেয়নি। বস্তি উন্নয়নের টাকা অন্য খাতে খরচ করেছে। কর্মী নিয়োগের নামে ৫০ জন দলীয় কর্মীকে পোষা হচ্ছে। গরিব মানুষের ‘পায়খানা’ তৈরির জন্য ৪০০০ টাকা করে দিয়ে বাকি ৬০০০ পান নি কেউ। লাগামছাড়া বেড়েছে জল সহ বিভিন্ন পরিষেবাখাতে খরচ। স্বাধীন নন্দী টি এম সি-র প্রার্থী। এই প্রবীণের দাবি, সবাই মিলে একজোট হোক টি এম সি-র বিরুদ্ধে। তবু তাঁরাই বোর্ড গড়বেন।

কংগ্রেস-তৃণমূলের চরম আঁকচা-আঁকচি এবারের ভোটে। কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সন্তোষ দাস। তাঁর দাবি এ পুরসভা ই-ক্যাটাগরির। তৃণমূল কোনও দায় নেয়নি। তাদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও উন্নয়নের কাজ চালিয়ে গেছেন তাঁরা। এবারে দায়িত্ব পেলে আরও সাজিয়ে তুলবেন শহর। টি এম সি এবারের ভোটে কংগ্রেসের ক্ষতি করতে সি পি আই(এম)-এর সাথে হাত মেলাচ্ছে।

এ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সি পি আই(এম) নেতা তপন কোঙার। তাঁর দাবি, সি পি আই(এম) নীতির ভিত্তিতে ভোটে লড়ছে। ২০০৫ থেকে ২০১০-এর বোর্ডে থাকাকালীন তাঁরা এ শহরের পরিকাঠামো গড়তে এগিয়েছিলেন। গত বছর এক ছটাক কাজ এগোয়নি। উল্টে দুর্নীতিতে বীতশ্রদ্ধ মানুষ।

তপনবাবুরা জোর দিচ্ছেন বিকল্প পরিকল্পনার উপর। কলেজ গড়তে তাঁরা জমি নিয়েছিলেন। যৌথ-উদ্যোগ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়েছিলেন। দুটি নতুন বাসরুট চালু হয়। পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়। বড় থেকে ছোট রাস্তাগুলোকে তাঁরাই একসূত্রে বেঁধেছিলেন। এবারে মানুষ সুযোগ দিলে দাঁইহাটকে মনের মতো করে সাজাতে চান তাঁরা।

কাটোয়া থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরের ‘দুয়োরানি’ দাঁইহাটের ভাগ্যে এবারে ‘কী’—জবাব মিলবে ক-দিন পরেই।

রুদ্ধজনের ব্রাত্য-সঙ্গীত

সুনামী গুপ্ত

না পাঠক, চমকে যাবেন না। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের(যিনি ‘জর্জদা’ নামেও অন্তরঙ্গ ছিলেন) আত্মকথার নামটিকে একটু অদলবদল করা হয়েছে মাত্র। কারণ, এই সময়কালে এ রাজ্যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি রুদ্ধ, শুভবুদ্ধির চেতনাও রুদ্ধ। যারা এই দুঃসহ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছেন না, যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, তাঁরা সবাই রুদ্ধজন। এদের অনেকেই আক্রান্ত, লাঞ্ছিত হয়ে মিথ্যা মামলায় জর্জরিত, কেউ কেউ কারান্তরালে রুদ্ধ হয়ে আছেন। রক্ত ঝরছে, খুন হচ্ছে, বেমাক্কা মারধোরে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে অনেক অনেক রুদ্ধজন কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। ভয় পাচ্ছেন গান করতে, নাটকে অভিনয় করতে, কলম আর তুলি নিয়ে মেরুদণ্ডী প্রাণি হিসেবে মনুষ্যত্বের পরিচয় ঘোষণা করতে। সত্তরের দশকের চেয়েও ভয়াল এক অপশক্তি এই রাজ্যকে গ্রাস করেছে। এই অপশক্তির চাওয়ার তালিকা অনেক অনেক। ১৮ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে কলকাতা কর্পোরেশনের সব ক’টি ওয়ার্ড তাদের পেতেই হবে। মাৎস্যন্যায়ের রাজ্যে তিনি নয়, তাদের তিমিঙ্গিলের (যা’ নাকি তিমি মাছকেও গিলে খায়, এমন অতিকায় জলদানব) মতো ভয়ানক খিদে। এই খিদে মেটাতে গেলে বিরোধী প্রার্থীদের মারধর করা, বাড়িতে হামলা করা এবং ভোটের দিন কাঠপুতুলি প্রহরীদের দাঁড় করিয়ে, সাধারণ ভোটারদের ভোট দেওয়াকে রুদ্ধ করে ‘অবাধ’, ‘শান্তিপূর্ণ’, ‘নিরপেক্ষ’, ‘গণতান্ত্রিক’ নির্বাচন করাবে। মিডিয়া সমীক্ষার সেফোলজিস্টরা (যাঁরা ভোটের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে বিশেষজ্ঞ) বলবেন—এ আর নতুন কথা কী? ওরা রাজ্যে ক্ষমতায় সমারূঢ়, আর কলকাতা কর্পোরেশনে বিরোধীরা আসন পাবে—এ’তো কম আস্পর্দ্ধার কথা নয়। রুদ্ধজন নীরবে সব হজম করুন। আর ঘরে ব ে স দেখুন-গণতন্ত্র কারে কয়!

এপ্রিলের ২৫ তারিখে এই রাজ্যে ৯১টি পুরুসভার নির্বাচন হওয়ার কথা আছে। এর মধ্যেই গয়েশপুর, তারকেশ্বর আর আরামবাগ দখল করা হয়ে গিয়েছে। বাকি জায়গাগুলিতে প্রার্থীপদ তোলা না গেলেও রুদ্ধ গণতন্ত্রের মহিমায় সমস্ত প্রচারে শাসকেরাই রেফারি অথবা আম্পায়ারের দায়িত্ব নিয়ে এই নির্বাচনলীলায় কেল্লা-ফতে করার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কিংবা পরাক্রান্ত বিক্রম গুপ্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনার যে নির্দেশই দিন না কেন, রাজ্য-প্রশাসন তা’ মানতে বাধ্য নয়। কেষ্ট মোড়ল কিংবা মিথ্যা প্রিয়দের হুংকার আকাশ-বাতাসকেও কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় ধর্মাক্ত, রক্তাক্ত বিরোধী পক্ষের মিছিল-সমাবেশ জনজোয়ার তৈরি করেছে বটে, কিন্তু ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন ঘটবে কিনা, সে ভবিষ্যতবাণী করা যাবে না। মনে পড়ছে বাহাত্তরে ভোটের পর টানা ৫ বছর সি পি আই(এম) এবং সহযোগী কিছু বামপন্থী দল কেবল বিধানসভাই বয়কট করেন নি, এই সময়কালের সমস্ত ধরনের নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন সর্বস্বতায় না ভুগে এই কঠিন আধা- ফ্যাসিবাদী রাজত্বেও গণসংগ্রাম ও শ্রেণিসংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছিল। এর জন্যে অবশ্য অনেক মূল্যও দিতে হয়েছে সেদিন। প্রায় দেড় হাজারের মত নেতা ও কর্মীকে জীবন দিতে হয়েছে। গোটা রাজ্য জুড়ে অগণিত মানুষকে ঘর ছেড়ে, চাকরি ছেড়ে দুঃসহ দারিদ্র্য ও অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে কোনো মতে বেঁচে থাকতে হয়েছে। মা-বোনেদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে বহুবার। শিক্ষায়তনগুলিতে ক্লেদাক্ত পরিবেশ তৈরি করে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেষ কথা অপশক্তির পাণ্ডারা বলে নি, জনগণই শেষ পর্যন্ত এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার অবসান ঘটিয়েছে। সেই ইতিহাসকে ভুলে গেলে চলবে না।

কেন্দ্রীয় বাহিনী বা রাজ্য পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশের টহলদারি, বুথে বুথে প্রহরা থাকবে কিনা, তা নিয়ে ভেবে চিন্তে লাভ নেই। বর্ধমান পুরসভার নির্বাচন কেমন হয়েছিল, সে কথা তো সবাই জানেন। ওনাদের ৩৫টি ওয়ার্ডই দরকার ছিল; সে সাধ পূরণ করার সব ব্যবস্থাই শাসকদল করেছিল। তবু কালের যাত্রার ধ্বনি ওরা শুনতে পায় না। বরং অমানুষী খিদে এতটাই প্রবল যে কলকাতা কর্পোরেশন আর ৯১টা পুরসভায় সব কটি আসন জিতে ক্ষমতার চোঁয়া-ঢেকুর ভাঙতেই হবে। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার। গণতন্ত্রকে রুদ্ধ করে, শুভবুদ্ধির মানুষজনকে রুদ্ধ করে ওরা আমজনতাকে যতই ব্রাত্য অশুচি করে রাখুক না কেন, বর্ষশেষে ঈশানের পুঞ্জমেঘ যেভাবে বাধাবন্ধহারা ঝড় তৈরি করার মতো রুদ্ধজনের মনের আকাশকে সংক্ষুব্ধ করে তুলছে, তাতে শেষ পর্যন্ত ব্রাত্যসঙ্গীতের উদ্দাম ঝংকার তৈরি হবেই। প্রশ্ন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—“কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে / বাঁশী সঙ্গীতহারা / অমাবস্যার কারা / লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে / তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে / যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু / নিভাইছে তব আলো / তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো? / তুমি কি বেসেছো ভালো।” রবীন্দ্রনাথের ‘ভগবান’ আসলে ইতিহাস-বিধাতা। ইংরেজ শাসক এবং তাদের পদলেহীরা যে নৃশংস অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল, তার প্রতিবাদেই এই কবিতার জন্ম।

আর আজ এই রাজ্যের সমস্ত শুভবুদ্ধি, সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রুদ্ধ হয়ে আছে। এখানে নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের মিছিলের ওপর লাঠি, কোথাও টিয়ারগ্যাস, জলকামান কিংবা গুণ্ডারাজের সমস্ত আয়ুধ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাদের কোনও কুণ্ঠা নেই, যেখানে প্রতিবন্ধীদের ওপর নির্বাচার নির্দ্বিধ আক্রমণ করতে ওদের এতটুকু হাত কাঁপে না, সেখানে কোনও সদিচ্ছা বা সৎক্রিয়ার নমুনা খোঁজা একান্তভাবেই নিরর্থক। তবু ইতিকথারও পরের কথা আছে। ‘দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড় দেখে মুহ্যমান হলে চলবে না। রুদ্ধজনের, ব্রাত্যজনের প্রলয়সঙ্গীতের উত্তাল ঝংকার অপশক্তির সমস্ত অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিক। সেই বার্তা নিয়েই বলা যায়—

ঝড়ের ফুৎকারে ভয়ের আঁধার কেটে গেলে,
শিলাবর্ষণের অবিরাম মূর্চ্ছনায় যে বেগ,
সেই বেগে সব অবরোধ পিছুটান ফেলে
হে মানুষ ভুলে যাও অহেতুক উদ্বেগ।
অপজাত ক্লেদ যতো চারপাশে জমা
অভিশাপ বজ্রাঘাতে সব শেষ হবে,
অমানুষী দানবের নেই কোনও ক্ষমা,
আঁধার আকাশে ফের বিদ্যুৎ চমকাবে।

রোড ট্রান্সপোর্ট এন্ড সেফটি বিল—২০১৪ বাতিলের দাবিতে

আগামী ৩০ এপ্রিল পথ-পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘট

নজরুল ইসলাম

কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ভ্রান্ত পরিবহন নীতির ফলে সমগ্র পরিবহন ব্যবস্থাটাই কার্যত ভেঙে পড়েছে। গোটা রাজ্য সহ আমাদের জেলাতেও পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলে যারা বিভিন্ন যানবাহনে যাতায়াত করেন তাঁরা এক মারাত্মক অসুবিধার মধ্যে পড়ছে। কথায় আছে 'টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাসা'—নতুন দিন, ভালো দিনের আশায় যাঁরা বিজেপি-কে ভোট দিলেন আজ তাঁরা কপাল চাপড়াচ্ছেন। এই কয়েক মাসেই জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বিজেপি ধনীদের স্বার্থবাহী দল, তাঁরা গরিব শ্রমজীবীদের জন্য কোন কাজ তো করছেই না। উল্টে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সমস্ত কাজ করছে। যেমন 'রোড ট্রান্সপোর্ট এন্ড সেফটি বিল—২০১৪'। এই বিলে পরিবহন ব্যবস্থাকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়ে পরিবহন শ্রমিকদের আরও শোষণের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। দুঃখের বিষয়, এই শ্রমিক বিরোধী বিলের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোনো উচ্চ-বাচ্চ করছে না।

কি আছে এই 'বিলে', খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে দু-একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। (১) প্রস্তাবিত বিলে ৩০২ ধারা অনুযায়ী দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোনো মৃত্যু হলে গাড়ির চালকের ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ন্যূনতম ৪ মাসের জেল। (২) দুর্ঘটনায় কোনো শিশুর মৃত্যু হলে ৩০২(বি) ধারায় চালকের ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ৭ মাসের জেল হবে। মনে রাখা দরকার শুধুমাত্র বাণিজ্যিক গাড়ি নয়, ব্যক্তিগত গাড়ি যারা চালান তারাও একই শাস্তির কোপে পড়বেন।

সরকার মনে করছে এর ফলে দুর্ঘটনা কমবে, এই অবাস্তব ভাবনার পরিণাম ভয়াবহ। এই বিল চালু হলে গাড়ির ড্রাইভার পাওয়া যাবে তো? এটা ঠিকই যে, দেশব্যাপী পথ দুর্ঘটনা প্রতিদিন বাড়ছে; বাড়ছে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও যা খুবই চিন্তার বিষয়—কিন্তু পথ দুর্ঘটনায় একমাত্র চালকই দায়ী এটা নিছক একতরফা দায়। চালকের দায়িত্ব ছাড়াও আরও নানান কারণে পথ দুর্ঘটনা ঘটে। যেমন ভাঙাচোরা রাস্তা, যান্ত্রিক গোলযোগ, টায়ার ও যন্ত্রাংশের দাম বৃদ্ধি, ফলত পুরানো টায়ার ও ভাঙা যন্ত্রাংশ দিয়ে গাড়ি চালানো, পথচারীদের অসর্তকতা, দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থা, ঘুষ নিয়ে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া, রাস্তায় যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করিয়ে একাংশ পুলিশের হাত বাড়িয়ে অবৈধভাবে টাকা নেওয়া, রাস্তার অপ্রতুলতা, বিশ্রাম না দিয়ে দীর্ঘসময় গাড়ি চালাতে বাধ্য করা ও কম মজুরিতে কাজ করানোর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অস্থিরতা ও মানসিক দুঃশ্চিন্তা সহ নানান কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। যা সরকারের পরিকাঠামো ও প্রশাসনের দায়। এই সমস্ত কারণগুলি উহ্য রেখে 'বিলে' শুধুমাত্র চালকদেরই দায়ী করা হচ্ছে। এছাড়াও আরও কতকগুলি মারাত্মক নিয়ম এই বিলে নিয়ে আসা হচ্ছে যেমন মোটরসাইকেল, ব্যক্তিগত গাড়ি ও বাণিজ্যিক গাড়ির রেজিস্ট্রেশন, কর আদায়, লাইসেন্স ও পারমিট সমস্ত কিছুই ব্যক্তিগত এজেন্সির কাছে দিয়ে দেওয়া হবে। এজেন্সি যেমন ফিজ ঠিক করবে তা দিতে বাধ্য থাকবে গাড়ির মালিক ও শ্রমিকরা। এই বিলে আরও একটি মারাত্মক বিষয় আনা হচ্ছে, এতদিন পর্যন্ত গরিব বাড়ির ছেলেরা আর্থিক সহ নানান কারণে বেশিদূর লেখাপড়া করতে না পেরে ড্রাইভারী শিখে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে ড্রাইভারী করে জীবন জীবিকা চালাতো। বর্তমানে এই বিলে বলা হচ্ছে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাস না হলে লাইসেন্স দেওয়া হবে না। এর ফলে মূলত গরিব বাড়ির কম লেখাপড়া জানা ছেলেরাই বিপদে পড়বে। যা এতদিন লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না।

আমাদের জেলাতে প্রায় ৮০ শতাংশ যাত্রী ও পণ্য পরিবহন হয় মূলত বে-সরকারি বাস-মিনিবাস, অটো, ট্যাক্সি ও ট্রাক-লরির মাধ্যমে। এই শিল্পে প্রায় ২ লক্ষাধিক শ্রমিক নিযুক্ত আছে। জেলার অর্থনীতির এক বিরাট অংশ এই শিল্পকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। অতীতে বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে জনসাধারণ ও শ্রমিকদের স্বার্থে সুষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলাতে জেলা শাসকের নেতৃত্বে আর টি এ বোর্ড তৈরি হয়েছিল। কোন রুটে কত বাস মিনিবাস, অটো চলাচল করবে তা সার্ভে করে আর টি এ বোর্ড নির্দিষ্ট করত। বর্ধমান জেলার শহরগুলিতে পৌরসভা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করত কোথায় কত মিনিবাস-বাস চলবে। শহরের ভিতর কোন সময় মালবাহি লরি প্রবেশ করবে সমস্ত কিছুই একটা পদ্ধতি মেনে নির্দিষ্ট করা হত। বর্তমান তৃণমূল সরকারের এই ৪ বৎসরে রাজ্য সহ জেলার পরিবহন ব্যবস্থা নৈরাজ্যে পরিণত হয়েছে। তুলে দেওয়া হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। আর. টি. এ বোর্ড কার্যত ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কতগুলি বাস-মিনিবাস, অটো, টোটো ও রিক্সা চলবে তার কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই, ফলে একদিকে যানজট বাড়ছে, দুর্ঘটনা বাড়ছে ও শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ছে। বর্ধমান শহরের মানুষও ভুক্তভোগী। বর্ধমান শহরে সুষ্ঠু পরিবহন নীতি না থাকার কারণে টোটোর সঙ্গে রিক্সা, টোটোর সঙ্গে টাউনসার্ভিস প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের লড়াই। হাঁড়ি চাপছে না রিক্সা শ্রমিকদের। মাঝে মধ্যে প্রশাসন টোটো ধরপাকড় করে অনুমোদিত বনাম অ-অনুমোদিত লড়াই বাধিয়ে দিচ্ছে। ফলে অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থা শহরকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়ই চাইছে শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হোক। এরই পাশাপাশি শাসক তৃণমূলের পক্ষ থেকে শ্রমিক ও মালিকদের নিকট হতে জোরপূর্বক তোলাবাজি তুলছে। এককথায় জনসাধারণ ও শ্রমিকরা প্রতিদিন এক নরক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে। যাত্রীসাধারণ ও শ্রমিকদের স্বার্থে প্রশাসনের উচিৎ জেলাতে সুষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পথ-পরিবহন শ্রমিকদের বেশিরভাগ ফেডারেশনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্দিষ্ট কতকগুলি দাবির ভিত্তিতে আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০১৫ ধর্মঘটে সামিলন হবে। আমাদের জেলাতেও মূলত ৪/৫টি দাবিতে শ্রমিকরা ৩০ এপ্রিলের ধর্মঘটে সামিল হবে।

দাবি সমূহ—

১। 'রোড ট্রান্সপোর্ট এন্ড সেফটি বিল ২০১৪' বাতিল করতে হবে।

২। বর্ধমান জেলায় সুষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৩। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে।

৪। সরকারি বাসগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৫। তৃণমূলি গুন্ডাদের তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে।

৬। পুলিশি জুলুম ও শ্রমিক হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

একটি ছোট্ট ঘটনা

—দ্বিতীয় পাতার পর

আর নগরের শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা দিবারাত্র দ্বার বন্ধ করে পড়াতে হবে।

রাজা কহিলেন—তবে তাই হোক।

সকলে সমস্বরে কহিল—জয় রাজনের জয়!

এরই মধ্যে একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটিল। আবার চাঞ্চল্য। রাজ-পাঠশালায় ফলপ্রকাশে বিরাট বিলম্ব ঘটিল। যদিচ ফলপ্রকাশ হইল তাহা বিভিন্ন বদ সংবাদপত্রে এবং অধিকতর বদ টিভি চ্যানেলে ফোকাস হইয়া গেল। ফলাফলে নাকি চরম গোঁজামিল রহিয়াছে। প্রচুর ভুল। অসম্পূর্ণ সেই ফল দেখিয়া ছাত্ররা খেপিয়া উঠিল। তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া রাজবাটী ঘিরিয়া ফেলিল। এই সমস্ত বদমাইশদের ঠাণ্ডা করিতে রাজসৈন্য মজুত হইল। পরপর দুইদিন একই কাণ্ড ঘটিল। দ্বিতীয় দিনও রাজভক্ত ছাত্রদল ট্যাঙাড়ে বাহিনী লইয়া রাজবাটী ঘিরিয়া ফেলিল। ইহার পর রাজপণ্ডিত তাহাদের প্রতিনিধিদলকে ডাকিয়া সব শুনিলেন এবং বলিলেন— তদন্ত হইবে। অমনিই রাজভক্তরা বলিয়া উঠিল— তবে! ওই যে উনি বলে দিলেন তদন্ত হবে। তবে আর সংশয় কোথায়?

পরদিন আবার রাজসভা বসিল। রাজন্ কহিলেন, ভাগিনা এ কী কথা শুনি?

ভাগিনা কহিল, মহারাজ। নিন্দুকগুলা খাইতে পায় না বলিয়াই অমন বলে।

রাজা কহিলেন, কিন্তু ছাত্ররা বিক্ষোভ করবে এ তো ভালো কথা নয়। সভাকবি কী বলো?

সভাকবি বলিলেন, পাখি সব করে রব / মিছে কেনো কলরব।

সভাসদরা বলিল, কেয়াবাত! কেয়াবাত!

সেনাপতি কহিল, রাজন। এই সমস্ত ছাত্ররা গাঁজা খায়। লজ্জাবস্ত্রে শ্লোগান লিখে বিক্ষোভ করে।

অমাত্য কহিল, মহারাজ! ইহাদের পিছনে এস এফ আই এবং ডি.এস.ও আই নামক দুইটি মার্কামারা দল রয়েছে। এদের বিশ্বাস করা যায় না।

মন্ত্রী কহিল—রাজন! এরা সব চাষিদের খেপাচ্ছে। ফসলের নাকি দাম নেই।

সভাকবি বলিলেন, চাষি করে খাই খাই / সাথে আছে এস. এফ. আই।

রাজা কহিলেন, কিন্তু ফলাফলে গোঁজামিলের কথা উঠছে যে!

রাজপণ্ডিত সভাতেই ছিলেন। বলিলেন, মহারাজ! গোঁজামিলে নয়। গোঁজ দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজা নাছোড়—কিন্তু কুলোকেরা বলিতেছে অযোগ্য সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়াই এই বিড়ম্বনা।

রাজপণ্ডিত কহিলেন, মহারাজ! রাজভক্তদের দুইটি কর্মী সংগঠন। তাহাদের আঁকচা-আঁকচিতে এইসব ফাঁস হইয়া পড়িতেছে।

বিদুষক বলিল, মহারাজ! এইসব ছাত্ররা পঠন-পাঠন ছাড়িয়া আন্দোলন করিতেছে। উহাদের পুনরায় 'আদর্শলিপি' পড়ানো হউক।

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ! ব্যাটাদের সাতদিনের জেল, তিন দিনের ফাঁসি হওয়া উচিত।

মহারাজ কহিলেন, রাজপণ্ডিত কী বলো?

রাজপণ্ডিতের স্মৃতি প্রখর, তিনি কহিলেন, রাজন! উপনিষদেই তো বলেছে—'মা ফলেষু কদাচন'।

সভাকবি বলিলেন, মা ফলেষু কদাচন। / আর কেনো আন্দোলন।

রাজা বলিলেন, ঠিক কি না!

গোটা সভা সমস্বরে বলিল—ঠিক! ঠিক!

যুব সম্মেলনগুলি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ২০তম জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে জোনাল স্তরের সম্মেলনগুলি চলছে সর্বত্র। ৩ মে জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যুব ফেডারেশনের জোনাল সম্মেলনগুলি চলছে। জোনাল সম্মেলন গুলিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রকাশ্য সমাবেশ। রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির দ্বাদশ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ সমাবেশ তারবাংলা অঞ্চলে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন ছাত্র-যুব আন্দোলনের নেতা পার্থ মুখার্জী, সংগঠনের জেলা সভাপতি দেবানন্দ

প্রসাদ, তুষার আচার্য। সভাপতিত্ব করেন হেমন্ত প্রভাকর।

মেমারি-১ জোনালের দ্বাদশ সম্মেলন বিনয় কোঙার নগর দেবীপুর শহিদ মঞ্চ শেঠিয়া হিমঘরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন রাজ্য সহ-সভাপতি সুজয় চৌধুরী। সম্মেলন থেকে অনুপম ব্যানার্জী সম্পাদক, কৃষাণু ভদ্র সভাপতি নির্বাচিত হয়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি অমিত বিক্রম পাঁজা, পিতা রাসবিহারী পাঁজা, গ্রাম ও পোঃ - নিগন, থানা - মঙ্গলকোট, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৭ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের নাম অনিক পাঁজা যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত অভিরূপ পাঁজা নথিভুক্ত হয়েছে। অনিক পাঁজা এবং অভিরূপ পাঁজা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি আনারুল সেখ, পিতা মহঃ আলি সেখ, বড়নডালা, উত্তরপাড়া, থানা - মন্তেশ্বর, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম আসরাফুল সেখ, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত সেখ আসরাফুল ইসলাম নথিভুক্ত হয়েছে। আসরাফুল সেখ এবং সেখ আসরাফুল ইসলাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৮৬৪ সালের ১৪ এপ্রিল, জন্ম ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি; ২। ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল, মনিপুরের থৈরঙ্গে, ১৫০০ বর্গমাইল এলাকা; ৩। ১৮৫৯ সালের ১৫ এপ্রিল; ৪। ১৮৬৪ সালের ১৫ এপ্রিল; ৫। ১৪৫২ সালের ১৫ এপ্রিল, ইতালিতে ১২ বছর; ৬। ইউরোপ মহাদেশে, কোপেন হেগেন, ৯৫০ সালের ১৬ এপ্রিল, সমুদ্র তট; ৭। ৫০০ দ্বীপ নিয়ে গঠিত; ৮। চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন, ১৬-৪-১৮৮৯, লন্ডনের ওয়ালওয়ার্থ-এর ইস্টলেনে, মৃত্যু - ২৫-১২-১৯৭৭; ৯। ১৯৫২ সালের ১৭ এপ্রিল; ১০। ১৫টি দেশের (তবে ভিন্ন নাম ভিন্নআঙ্গিক); ১১। ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল; ১২। জার্মানির ব্রাউনাউগ্রামে, ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল।

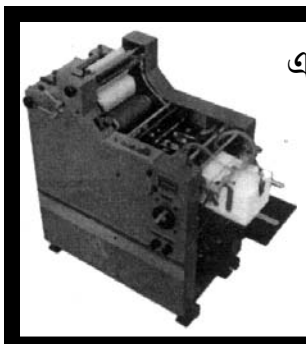

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

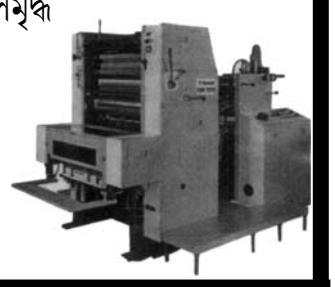

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা